সমুদ্রপথে জাহাজে বসে মিশনারি ডা. জন টমাসের (১৭৫৭-১৮০১) সঙ্গে মিশনারি কেরী বাংলায় বাইবেলের প্রাথমিক কাজ শুরু করেন। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলার মদনাবাটি গ্রামে কেরী, ফাউন্টেন ও রামরাম বসুর সহযোগিতায় বাংলার বাইবেলের অনুবাদের কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ পনেরো (১৫) বছর বাইবেল চর্চার পর বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেল প্রকাশিত হয় ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে।

উইলিয়াম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪) মৃত্যুর পর শ্রীরামপুর মিশন থেকে কলকাতায় বাংলা বাইবেল চর্চার পীঠস্থান হয়। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশনারি রেভারেন্ড ইয়েটস্ কেরীর বাংলা বাইবেল ত্যাগ করে নতুন ভাবে সমগ্র বাইবেলের বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে জন ইয়েটসের সহকর্মী রেভারেন্ড জন ওয়েঙ্গার এই বাংলা অনুবাদের নতুন সংস্করণ করেন। এর পর প্রায় পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছর পর কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশনারি রেভারেন্ড ড. জি. এইচ. রাউস বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করেন। পাশাপাশি কলকাতায় সি. এম. এস. (চার্চ মিশনারি সোসাইটি) বাইবেলের বাংলা অনুবাদের প্রয়াস চালিয়ে ছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে সি. এম. এস. মিশনারি আর. পি. গ্রীভস্ 'সিনপ্‌টিক সুসমাচার' (মথি-মার্ক-লুক-জন্) কে বাংলাতে অনুবাদ করেন। পনেরো (১৫) বছরের মধ্যে তাঁরা স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ করেন। পনেরো (১৫) বছরের মধ্যে তাঁরা স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। এইভাবে খ্রিস্টীয় উনিশ শতকে বিদেশি ধর্ম-যাজকেরা বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজ করেছিলেন।

সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে—বাঙালি মনীষীদের মধ্যে বাংলা ভাষায় বাইবেল চর্চায় উদ্যোগ দেখা যায়। এই বাঙালি মনীষারা হলেন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩), রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৮৪০-১৯০৫) ও স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) প্রমুখ। এরই পাশাপাশি বাংলায় বাইবেল চর্চায় বাঙালি খ্রিস্টানেরা পিছিয়ে ছিলেন না। উনিশ শতকের স্বনামধন্য বাঙালি খ্রিস্টানদের মধ্যে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা বাইবেলের (১৮০৯-২০০৯) অনুবাদ সমীক্ষা

বাইবেলের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রধানত দুই ভাষার কার্যকর ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা যায়।—

১) **মূল ভাষা ঃ** অর্থাৎ যে ভাষায় লিখিত গ্রন্থকে অনুবাদ করা হচ্ছে। এখানে বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র ভাষা হিব্রু ও 'নিউ টেস্টামেন্টে'র ভাষা গ্রীক।

২) **অনুবাদ ভাষা ঃ** যে ভাষায় গ্রন্থ অনূদিত হচ্ছে; এখানে তা হল প্রধানত বাংলা ভাষা। অনুবাদের জন্য দুটি ভাষার সঙ্গে অনুবাদকের সম্পর্ক মোটামুটি তিন দিক থেকে লক্ষ করা যায়। যেমন—

ক) অনুবাদক মাতৃভাষা থেকে কোনো অর্জিত ভাষায় অনুবাদ করেন।

খ) অনুবাদক কোনো অর্জিত ভাষা থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করেন এবং

গ) অনুবাদক কোনো অর্জিত ভাষা থেকে অপর কোনো অর্জিত ভাষায় অনুবাদ করেন।

উনিশ শতকের বিদেশি খ্রিস্টান মিশনারিরা হিব্রু ও গ্রিক থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। মূলভাষা ও অনুবাদ ভাষা দুই-ই ছিল তাঁদের কাছে অর্জিত ভাষা। কোনটাই তাঁদের মাতৃভাষা নয়। তাঁদের মাতৃভাষা ছিল ইংরাজি ভাষা।

অনুবাদকের মাতৃভাষা একটি পরোক্ষ তৃতীয় ভূমিকা সংগোপনে আত্মরক্ষা করে। এই ধরনের অনুবাদে তিন ভাষার সূত্র কার্যকর হয়। মূলভাষা ও অনুবাদ ভাষার মধ্যস্থতা করে অনুবাদকের মাতৃভাষা। উনিশ শতকের বিদেশি খ্রিস্টান মিশনারিরা এই তৃতীয় পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁদের অনুবাদে মধ্যস্থ ভাষা হিসাবে ইংরাজি ভাষার সক্রিয়তার কথা উপেক্ষা করা যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই অনুবাদকের মাতৃভাষা ইংরাজি ভাষা মধ্যস্থতার অন্তরালে অনুবাদককে ও তাঁদের অনুবাদকে প্রভাবিত করে গেছে।

উনিশ শতকে বিদেশি খ্রিস্টান মিশনারিরা বাংলায় বাইবেল অনুবাদে সাহিত্যিক অভিব্যক্তির জন্য মৃদু ভর্ৎসিত হন। তবে দুটি বিশেষ কারণ বিবেচনা করে দেখা উচিত। যেমন—

১) তাঁরা অপটু ভাষাকে অনুবাদকের মাধ্যমে ব্যবহার যোগ্য করে তোলেন। সেই ভাষা গদ্য গড়ে ওঠার ইতিহাসে প্রবর্তকের গরীয়ান ভূমিকায় নিজেদের সংযুক্ত করে গেছেন।

২) অনুবাদকের উদ্দেশ্য : অনেক সময়েই অনুবাদকের কোনো মানবিক কারণে আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠেছেন।

তাতে কোনো সন্দেহ নেই; বাংলার বাইবেলের অনুবাদের মধ্যে এই উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল। অন্তত পবিত্র ধর্মশাস্ত্র অনুবাদের ক্ষেত্রে, এই মহৎ অথবা দৈব প্রেরণা-শক্তি সম্ভবত উপেক্ষা করা যায় না।

উনিশ শতকের বাংলা বাইবেল কেন কৃত্রিম ও অবাংলা এ অভিযোগ তোলার আগে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিমত উল্লেখ করা প্রয়োজন। চারুচন্দ্র বসুর 'ধম্মপদ' এর বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলাইয়া করিলেই ভালো হয়।...মূলের যে সকল কথার অর্থ সুস্পষ্ট নহে, অনুবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্তব্য মনে করি।"

বিদেশি মিশনারিদের বাংলা বাইবেলের অনুবাদে দুটো বিশেষ দিক পরিস্ফুট হয়েছে।—

১) অনুবাদ ভাষার যোগ্যতা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

২) অনুবাদ ভাষার উৎকর্ষ বিধানে সর্বদা মনস্ক ছিলেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে—অনুবাদে ভাষাতাত্ত্বিক মনস্তত্ত্বই তাঁর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল। তাই উনিশ শতকে বিদেশি মিশনারিদের বাইবেলের বাংলা অনুবাদকে একটি সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত হবে।

তবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলায় বাইবেল অনুবাদের মূল্য গুরুত্বহীন নয়। ইংরাজি গদ্যের জনক হিসাবে রাজা আলফ্রেডের নাম স্মরণ করা হয়। অনুবাদের মাধ্যমেই রাজা আলফ্রেড ইংরাজি গদ্যের সূচনা থেকে যথার্থ সাহিত্য গদ্য হয়ে উঠতে সময় নিয়েছিল; বেশ কয়েকশো বছর। এদিক থেকে বাংলা গদ্যের বাইবেল অনুবাদের সংস্পর্শে এসে কেরী থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে সাহিত্যগুণ পেয়েছিল। মাত্র অর্ধ-শতাব্দীরও কম সময়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যিক গদ্য হিসাবে মান্যতা পেয়েছে। ১৮০৯-১৮৪৭ মাত্র ৩৮ বছরের মধ্যে বাংলা গদ্যের শিল্প সৃষ্টি হয়ে ছিল।

উনিশ শতকের বাংলায় বাইবেল অনুবাদের ভাষা ভঙ্গিমা অভ্যস্ত হলেও সাধু ভাষার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। উপনিবেশিকতার সঙ্গে যুক্ত একটি অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব সর্বাধিক। উনিশ শতকের বাংলা বাইবেল তা থেকে বার হবে কি করে? একদিকে ইংরাজি ভাষার রীতির শব্দক্রম, অন্যদিকে সংস্কৃতায়নের চাপে বাংলা বাইবেল নিজস্ব গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারেনি।

উনিশ শতকে বিদেশি প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজকদের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের তর্ক-বিতর্কের ফলে বাংলা গদ্যে নতুন প্রাণ রসের সঞ্চারিত হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম পাঁচ দশকে যে সব বিদেশি ধর্মযাজকের অক্লান্ত কৃচ্ছসাধনের সাধনায় বাংলা গদ্যের ভবন নির্মিত হল তাঁরা ছিলেন বাংলা ভাষা বই তথা বাংলা বাইবেলের স্থপতি। ভাষাযাজক কেরীর বাংলা গদ্য রচনা আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি কালের প্রথম মাইলস্টোন। গ্রীয়ার্সন সাহেবের হিসাব অনুসারে উনিশ শতকের শুধু প্রথম তিন দশকেই শুধু শ্রীরামপুর মিশন থেকে দুলক্ষ বারো হাজার বাংলায় বাইবেল ছাপা হয়েছিল। এছাড়া কলকাতায় বি. এম. এস., সি. এম. এস. ও বাইবেল সোসাইটির বাংলা বাইবেল তো ছিলই। আসলে খ্রিস্ট বাণী প্রচার করতে গিয়ে মিশনারিরা বাংলার নবজাগরণের সহায়তা করে ফেলেছেন। বাংলা বাইবেলের প্রভাবের সর্বাপেক্ষা বড় দান হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রতিবাদ, তর্ক-বিতর্কের ও অনুবাদ গদ্যের মাধ্যমে বাঙালির নবজীবনবাদের জন্ম। গদ্যের পাত্রে এল ধর্মীয় বাস্তবতা। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধের বাংলা অনুবাদ তথা সাহিত্যকে তাই বাইবেল ভাবোদ্বুদ্ধ বাঙালি মননের বিকাশ ভূমি বলা যায়।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ভাবে ও ভাষায় সমর্থ করে তুলতে কৃত্তিবাস-মালাধর গোষ্ঠীর যুগান্তকারী ভূমিকা বাংলা সাহিত্যেরই অন্তর্গত দৃষ্টান্ত। সেই মহৎ অনুবাদ গোষ্ঠীর ভূমিকার আলোকে বিদেশি মিশনারিদের দেখলে খুব ভুল হবে না। তাঁদের সঙ্গে এঁদের প্রভেদ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কৃত্তিবাস-মালাধর বঙ্গভাষা ভাষী ছিলেন; আর এঁরা ছিলেন বিদেশি, তথা ইংরাজি ভাষী।

সর্বোপরি একথা অবশ্যই বলা যায়। বাইবেল সংস্কৃতির ছোঁয়ায় বাংলার চেতনায় এবং তৎপরতায় পরিবর্তন এল। দেখা দিল বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ ও জীবনধর্মী মানবিকতা। বাঙালির চেতনার আকাশে ক্রমে দেখা দিল বাংলারই কিছু হৃদয়দৃপ্ত ব্যক্তির যারা বাইবেল চর্চা করে বুঝিয়েছিলেন বাঙালি উদারপন্থী জ্ঞানচর্চায় বিশ্বাসী, **বাংলা ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে বাইবেলের প্রথম বাংলা অনুবাদ হয়**। এর আগে হিন্দু, জৈন ও ইসলাম শাস্ত্রের কোনো বাংলা অনুবাদ হয়নি। সেই দিক থেকে বাংলা বাইবেল, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পথিকৃতের দাবি করতে পারে।

বিশ শতকের বাংলা বাইবেল

মিশনারি উইলিয়াম কেরীর প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীকালে কেরীর ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাইবেলের বাংলা অনুবাদের কয়েকটি সংস্করণ ভারতের বাইবেল সোসাইটি প্রকাশ করে। কলকাতা থেকে বাংলা বাইবেলের সর্বশেষ সংস্করণ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় 'নিউ টেস্টামেন্টে'র একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত বাংলা সম্পূর্ণ বাইবেল ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ এবং ফরেন বাইবেল সোসাইটি—অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য প্রকাশ করেন 'গুড নিউজ বাইবেল'—টুডে'জ ইংলিশ ভার্সান। ভারতের বাইবেল সোসাইটিও এই রকম কাজে এগিয়ে আসে। বিশ শতকের ষাটের দশকে সাধারণের বোধগম্য আধুনিক বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশের প্রকল্প গ্রহণ করেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক সহজ বাংলায় পরীক্ষামূলক ভাবে (Ten tative) বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট' প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে সমগ্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদের ভাষার ব্যাপক পরিমার্জনা করা হয়।

তিনটি বিশেষ কারণে বাইবেলের মতো একটি পুরাতন, সর্বজনীন ও সর্বকালীন গ্রন্থের বিভিন্ন সময়ে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন হয়।

১) ভাষা পরিবর্তনশীল। কেরীর সমসাময়িক বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনের ফলে আজ তা সম্পূর্ণ পরিবর্তি হয়েছে। আধুনিক পাঠকের কাছে উনিশ শতকের অনুবাদ দুর্বোধ্য ও অচল হয়ে পড়েছে।

২) নিরলস গবেষণার ফলে **বাইবেলের মূল পাঠ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য হিব্রু ও গ্রিক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে**। ফলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় সংশোধিত নতুন বাইবেলের অনুবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে।

৩) আক্ষরিক অনুবাদ ধারণাটি বর্তমানে বর্জিত হয়েছে। উনিশ শতকের অনুবাদগুলিতে বাংলা ভাষার নিজস্ব রচনাশৈলী উপেক্ষা করে হিব্রু ও গ্রিক ভাষার রচনাশৈলী হুবহু অনুকরণ করা হয়েছে। সেজন্য বৃহত্তর বাঙালি পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি।

আধুনিক পাঠকের কথা মনে রেখেই, 'ভারতের বাইবেল সোসাইটি' ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক বাংলায় বাইবেল প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতার বাইবেল সোসাইটির মুখ্য অনুবাদক-পরিচালক শ্রীমতী দীপালি রায় এই আধুনিক বাংলা বাইবেল সম্পর্কে চারটি বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

১) এই অনুবাদ হিব্রু ও গ্রিক বাইবেলের মূল বক্তব্যের অনুসারী হয়েছে কিনা, এর অন্তর্নিহিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হয়েছে কিনা।

২) ঈশতত্ত্বমূলক বিষয়গুলি অক্ষত আছে কিনা।

৩) মূল ভাষার সাহিত্যিক সৌন্দর্য অনুবাদের ভাষার স্বাভাবিক ভাবে সাঙ্গীকরণ করা সম্ভব হয়েছে কিনা।

৪) বাংলা ভাষার নিজস্ব মান, সাহিত্যিক শিল্প সৌন্দর্য ও সাবলীল বহমানতা বজায় আছে কিনা, কারণ এইটিই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করার চাবিকাঠি।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের এই নতুন সংস্করণে বাংলা বাইবেল পাঠকদের উপযোগী ও অভিনব মাত্রা এনে দিয়েছে। বাইবেলের মোট ৬৬টি পুস্তকের প্রথমেই ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা ভাষার একটি উদাহরণে দেখা যাক—

১) **শলোমনের মধুরতম গীতি**

প্রেমিকা :

২) ওগো প্রিয়তম,
চুম্বনে চুম্বনে
আজ ভরে দাও
বিবশ অঙ্গ মোর,
তোমার প্রেমের কাছে,
সুরাও যে হার মানে।

৩) তব প্রিয় নাম মোর হৃদয়ে ছড়ায়
তব দেহ-সৌরভ,
তাই তো তুমি হে নয়ন মোহন
ললনার এত প্রিয়।

বাইবেলের এই বাংলা অনুবাদ, যেন বাংলা গীতিকবিতার সুর-মূর্ছনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর ইহুদীদের প্রার্থনা গীতি যেন বৈষ্ণব পদাবলীর ভক্তিগীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার খ্রিস্তিয়াঁ মিংঙো ও কবি সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মঙ্গলবার্তা' প্রকাশ; বাংলা বাইবেলের এক স্মরণীয় সংযোজন। অনুবাদ প্রসঙ্গে যুগ্ম অনুবাদক-সম্পাদক বলেছেন, "যীশু ও তাঁর লেখক-শিষ্যেরা যদি বাঙালি হতেন, যদি একালেরই মানুষ হতেন, তাহলে তাঁরা যে বাংলা ব্যবহার করতেন, আমরা আমাদের অনুবাদে তেমন বাংলা ব্যবহার করতেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।"

তথাকথিত আক্ষরিক অনুবাদের পথ ধরে নেয়। প্রাচীন ও ভিনদেশী বাচন-রীতিকে এমন ছাঁচে ফেলা সম্ভব, যা আজকের বাঙালির কি কান কি প্রাণ, দুই-ই তৃপ্ত করতে পারবে। কোনো কোনো হিব্রু ও গ্রীক শব্দের অর্থ স্পষ্ট করে তুলতে একাধিক বাংলা শব্দের ব্যবহার করতে হয়। আবার এমন অনেক গ্রীক ও হিব্রু শব্দ আছে, যার মধ্যে একই সঙ্গে বহু অর্থের দ্যোতনা রয়েছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে একই গ্রীক শব্দের অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন বাংলা শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। গ্রীক বাক্যবিন্যাসের অদল-বদল করা হয়েছে। অতি দীর্ঘ বাক্যকে দরকারমতো ছোট ছোট বাক্যে অনূদিত করা হয়েছে। গ্রীক ভাষার বিশেষ বাচন ভঙ্গি হুবহু বজায় রাখার চেষ্টা না করে মূল বক্তব্য সেই বাচনভঙ্গিতেই ব্যক্ত করা হয়েছে, যা বাংলায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক শোনায়। বাচনভঙ্গির

উপযুক্ত রূপান্তরের ওপরেই নির্ভর করে অনুবাদের সার্থকতা। 'মঙ্গলবার্তা' সেই দিক থেকে সার্থকতা লাভ করেছে।

বাইবেলের মঙ্গলসমাচারগুলি পড়লেই বোঝা যায়, যিশুর বাণী প্রচারিত হয়েছিল সাধারণ দরিদ্র মানুষদের মধ্যে। যারা প্যালেস্টাইনের গ্রামগঞ্জে বা ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে চাষবাস করে, গরু-ভেড়া চরিয়ে, কিংবা মাছ ধরে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটত। সুতরাং সেই খ্রিস্ট বাণী পণ্ডিতী ভাষায় অনুবাদ করলে নিতান্তই কৃত্রিম হয়ে যাবে। তাই এই অনুবাদ সোজা-সরল ঘরোয়া ভাষায় প্রত্যক্ষ ভঙ্গিতে বলা হয়েছে।

সেন্ট পিটার ও সেন্ট পলের ভাষা তাত্ত্বিকের দুরূহ ভাষা। যথাসম্ভব দীর্ঘ জটিল বাক্য এবং অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দ পরিহার করে স্বাভাবিক সুবোধ্য অনুবাদ করা হয়েছে। বাইবেলের একই বক্তব্যের নানা অর্থ হতে পারে এবং তার আবার নানা ব্যাখ্যা হতে পারে। সেজন্য এই অনুবাদে পাদটীকার সাহায্য অসাধারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় আছে নির্ভরযোগ্য ভাষ্যকারের মতামত। যা বাইবেলের বাংলা অনুবাদের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রতিটি পুস্তকের বিস্তারিত ভূমিকায় লেখকের পরিচয়, সংক্ষিপ্ত সার, রচনারীতি সহ বাইবেলের কাহিনি অভিনব মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

হিব্রু বা গ্রিক ভাষাবৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে বাংলার নিজস্ব বাচনভঙ্গিতেই অনুবাদ করা হয়েছে। যেমন—

হিব্রুতে	**বাংলাতে**
* তাঁরা অন্য সকলের দশ হাত ওপরেই রয়েছেন।	* অন্য সকলের চেয়ে তাঁরা দশগুণ শ্রেয়।
* আমরা হাড়গুলো আমার চামড়ায়, আমার মাংসে এঁটেই আছে	* আজ হাড় জিরজিরে শরীর আমার।
* আমি দাঁতের চামড়া নিয়েই উদ্ধার পাচ্ছি।	* কোন রকমে প্রাণে বেঁচে আছি আমি।

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে একই ভাবটা প্রকাশ করার ভঙ্গিতে হিব্রু ও বাংলা ভাষার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। বিদেশি ভাষার গন্ধ দূর করে যথাসম্ভব মৌলিক বাংলায় অনূদিত হয়ে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ এক নতুন মাত্র এনে দিয়েছে। সামসঙ্গীতের একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়।

সামসঙ্গীত—১

পাপ পুণ্যের পথ

১। ধন্য সেই মানুষ, দুর্জনের মন্ত্রণায় যে চলে না;
পাপীর পথে যে পা বাড়ায় না,
বসে না বিদ্রূপকারী দাম্ভিকের সভায়!

২। ধন্য সেই মানুষ, ভগবানের বিধানই যার আনন্দ,
তাঁর বিধানই যে নিশিদিন জপ করে!

৩। সে যেন জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষেরই মতো,

সময় হলেই যা ফলে ভরে ওঠে;
যার পাতা কখনো হয় না ম্লান।
সে যা কিছু করে, তাতেই সে সফলতা পায়।

মঙ্গলবার্তা বাইবেলে কয়েকটি লেখা আছে, যা কখনো বাংলা ভাষাতে অনূদিত হয়নি। উনিশ শতকের প্রথম বাংলা অনুবাদের গ্রন্থে ছিল না। বিশেষ করে 'প্রজ্ঞা', 'বেন-সিরা', 'তোবিত', 'যুদিথ' ও '১-২ মাকাবী'—এই ক'টি গ্রন্থের মধ্যে সারগর্ভ নানা ধর্মালোচনা আছে। ক্যাথলিক মিশনারি ফাদার খ্রিস্তিয়াঁ মিংঙোর এই অনুবাদ সাধনায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করলেন।

বাংলাদেশের 'বিজয় বাইবেল' (১৯৯২)

'বিজয় বাইবেল' পড়ার সুবিধার জন্য পদক্ষেপগুলি অভিনব। এই অনুবাদ করার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বিজয় বাইবেল। যেমন—১। বিষয়ের শিরোনাম ২। সমতুল্য শাস্ত্রাংশ পদ্ধতি (ক্রস-রেফারেন্স) ৩। ফুটনোট সমূহ ৪। টীকা ৫। টীকাগুলিকে ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। * ব্যাখ্যা মূলক * ধর্মতত্ত্বমূলক * * ভক্তিমূলক * নৈতিকতামূলক * ব্যবহারিক ৬। প্রবন্ধ—গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়গুলিকে নিয়ে নোটের চেয়ে বেশি আলোচনা সমৃদ্ধ রূপে প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে। ৭। পুস্তক পরিচিতি * বাইবেলের প্রত্যেকটি বইয়েরই একটি পুস্তক পরিচিতি অংশ আছে, যার মধ্যে আছে * সংক্ষিপ্ত রূপপেখা, * লেখকের নাম, প্রসঙ্গ, লেখার সময় * বইটির পশ্চাদপট ও ঐতিহাসিক অবস্থানের ব্যাখ্যামূলক পটভূমি * বইটির প্রকৃত উদ্দেশ্য * বিষয়বস্তু * বিশেষ বৈশিষ্ট্য * একটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার একটি পরিকল্পনামূলক তালিকা ৮। সারসূত্র-১২টি প্রতীকের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। ৯। ছক/তালিকা ১০। মানচিত্র-৪৩টি মানচিত্র আছে 'বিজয় বাইবেলের' মধ্যে এবং শেষে ১৬টি রঙিন মানচিত্র। ১১। বিষয়বস্তুর সূচী ১২। সারসূত্রের সূচী ১৩। পাঠের পরিকল্পনা ও সবশেষে আছে ১৪। চয়নিকা—সহজেই বাইবেলের পদ খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের এই 'বিজয় বাইবেল' ছাত্র ও গবেষকদের কাছে আদরণীয় হবে। বাইবেলের একটি পুস্তকের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাচাই করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বাইবেলের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা হবে। বাইবেলের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ধারণা সহজেই বোধগম্য করার জন্য এই পরিকল্পনা এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে।

বাংলা বাইবেলের ভাষা

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বিদেশি মিশনারিদের হাতে সেরকম কোনো বাংলা গদ্য ছিল না। তাই সবটাই ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার উন্মেষ লগ্ন। বাংলা গদ্য কতখানি ভালো হয়েছে সেটা বড় নয়। তাঁরা বঙ্গদেশকে ভালোবেসে, বাংলা ভাষাকে অন্তর দিয়ে, আজীবন চর্চা করেছেন। উপহার দিয়েছেন বাইবেলের মতো নতুন বিষয়। এই বিষয় বৈচিত্র্যের স্বাদ বাঙালির মননে কম নয়, যার গৌরব অপরিমেয়।

রেভারেন্ড কেরী বাইবেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'Baptism' শব্দের অনুবাদে 'ডুবন'

ব্যবহার করেছিলেন। 'Baptism' শব্দের অনুবাদে 'ডুবন' শব্দটি আক্ষরিক হয় বটে শব্দটির গভীর তাৎপর্য বহন করে না। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজে 'আহ্নিক' বা 'ওজুর' পরিবর্তে অন্য কোনো বিকল্প শব্দ গ্রহণ করা চলে না। তাই শব্দটি বাংলা বাইবেলে 'বাপ্তিস্ম' রূপেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরীর শেষ সংস্করণের ছয় বছর পরে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে বাংলা ভাষায় রোমান অক্ষরে একটি বাইবেল প্রকাশিত হয়। এই বাংলা বাইবেলের অনুবাদক ছিলেন মিশনারি উইলিয়াম ইয়েটস্ (১৭৯২-১৮৪৫)। আচার্য সুকুমার সেন লেখেন, 'এই বাংলা বাইবেলের ভাষা এমন চমৎকার যে সেকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখকেরাও এর থেকে ভালো বাংলা গদ্য লিখতে পারে নি।' উদাহরণ দেওয়া হল—

"জোহান নামে বাপ্তাইজক সেই সময় যিহুদা দেশের প্রান্তরেতে উপস্থিত হইয়া প্রচার করিয়া কহিল, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল। পরমেশ্বরের পণ প্রস্তুত কর, ও তাঁহার রাজপথ সমান কর।'

বিশ শতকের বাংলা বাইবেলে আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য স্থান ও ব্যক্তিবর্গের নামের উচ্চারণের পরিবর্তন করা হয়েছে।

যেমন। বাবিল = ব্যাবিলন। দন্মেশক = দামাস্কাস
নবখদনিৎসর = নেবুকাডনেজার, তার্শিশ = স্পেন
কিট্টিম = সাইপ্রাস ইত্যাদি।

হিব্রু ভাষায় ঈশ্বরের নাম 'ইয়াহ্ওয়ে'—পরে হয় 'যিহোবা'। বাইবেলের 'কিং জেমস্ সংস্করণের' পরবর্তী ইংরাজি সংস্করণগুলিতেও প্রভু = বড় হাতের অক্ষরে The LORD ব্যবহার করা হয়েছে। কেরী ও পরবর্তী অনুবাদকেরা 'সদাপ্রভু' ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ ও সাহিত্যে 'সদাপ্রভু' শব্দটির মূলগত কোনো স্থান নেই। সেজন্য বিশ শতকের কলকাতা বাইবেল সোসাইটির দীপালি রায় - 'প্রভু পরমেশ্বর', 'সর্বাধিপতি' 'প্রভু পরমেশ্বর', 'সার্বভৌম ঈশ্বর' নামে অভিহিত করেছেন। হিব্রু ভাষায় ঈশ্বরের নাম 'ইয়াহওয়ে' শব্দটির মানে হচ্ছে—'যিনি ছিলেন, যিনি আছেন ও যিনি থাকবেন।' সেদিক থেকে দীপালি রায়ের শব্দগুলি অনেক বেশি কাছাকাছি এসেছে।

বিশ শতকের শেষে বিভিন্ন বাইবেলের নামকরণ ও ভাষা তুলনামূলক ভাবে উদাহরণ দিয়ে বিচার করা হল। যেমন—

'পবিত্র বাইবেল'—	**'মঙ্গলবার্তা'**—	**'বিজয় বাইবেল'**
(কলকাতা বাইবেল সোসাইটি)	(সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)	(বাংলাদেশ, ১৯৯২)
১৯৮০	(১৯৯৩)	প্রেরিত
প্রেরিত গীত	শিষ্য চরিত	গীতসংহিতা
সংহিতা প্রকাশিত	সামসঙ্গীত	প্রকাশিত বাক্য
বাক্য	প্রত্যাদেশ	

গীতসংহিতা - ১০৬	**সামসঙ্গীত - ১০৬**	**গীতসংহিতা - ১০৬**
১। প্রভু পরমেশ্বরের প্রশংসা কর! ধন্যবাদ কর। তাঁর কারণ তিনি মঙ্গলময়, নিত্যস্থানীয় তাঁর অবিচল প্রেম।	১। জয়তু জয়তু ভগবান! ভগবানের স্তবগান কর! কত না মঙ্গলময় তিনি; আহা, তাঁর সেই দয়া, সে তো চিরন্তন।	১। তোমার সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, সদা প্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী।
২। কে পারে বর্ণনা করতে প্রভু পরমেশ্বরের মহান কীর্তিরাজি? অথবা কে পারে নিবেদন করতে তাঁর যথাযোগ্য প্রশংসার অর্ঘ্য?	২। কেই বা বলতে পারে ভগবানের শক্তিময় কীর্তির কাহিনী; কেই বা শোনাতে পারে তাঁর সর্বগুণের বন্দনা?	২। কে সদাপ্রভুর বিক্রমের কার্য্য সকল বর্ণনা করিতে পারে? কে তাঁহার সমস্ত প্রশংসা প্রচার করিতে পারে?

বিশ শতকের তিনটি বাংলা বাইবেল পাশাপাশি তুলনা করলে বোঝা যায়—এই বাংলা একেবারে আধুনিক বাংলা। তত্ত্বগত বিভাগ যাই থাকুক এই বাংলা ভাষা সহজ-সরল, সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। যদিও বিশ শতকের শেষে এসে এখনও 'প্রভু পরমেশ্বর', 'ভগবান' না 'সদাপ্রভু' এই বিতর্কের শেষ হয়নি। ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এই বিতর্ক শেষ হবার নয়, মনে হয়। ভাষা নিয়ে তত্ত্ব নিয়ে তর্ক চলতে থাকুক, বাঙালির কাছে বিদেশি বাইবেল উপাদেয় হয়েছে—তার প্রমাণ সাহিত্যে বিভিন্ন অনুষঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য

বাইবেলের মতো এমন মহাগ্রন্থ বহুদিন ধরে রচিত হয়েছে। তাই সাধারণ ভাবে বাইবেলকে সেই নির্দিষ্ট স্থানের লোকসংস্কৃতির প্রকাশ বলা অসঙ্গত হবে না। বাইবেলের বাগধারা বাক্যাংশ প্রভৃতি সাহিত্য প্রয়োগ করে ভাষাকে আলংকারিক করে তুলেছিল সমগ্র ইংরাজি সাহিত্য। বিশেষত ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে বাইবেলের কিং জেমস্ সংস্করণের পর বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে।

যে সকল বিশিষ্ট গ্রন্থ বাইবেলে আছে, তার মধ্যে 'Proverb' নামে একটি গ্রন্থও আছে। সমগ্র বাইবেলে প্রবাদ জাতীয় নমুনায় সে যুগের প্রচলিত প্রবাদের বৈশিষ্ট্য কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। বাইবেল প্রসঙ্গে 'প্রবাদ' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার হয়েছে, তা বর্তমানা আলোচ্য 'প্রবাদ' এর মতো বোধ হয় না। কিংবদন্তি, প্রথা ইত্যাদি শব্দের সাযুজ্য যেন বেশি। সুতরাং এই আলোচনায় 'প্রবাদ' শব্দটিকে উদার অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, এখানে সেই পদ্ধতিতে 'বাইবেলী প্রবাদ' নিয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা ভিন্ন মাত্রা এনে দেবে।

'নিষিদ্ধ ফল' বা 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল'—এই দুটি প্রবাদের উৎস হল বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম গ্রন্থের তিন অধ্যায়। একই কাহিনী থেকে দুটি প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। একটি কাহিনীর দুটি প্রতীকী আবরণ। 'স্বর্গোদ্যানে পৃথিবীর প্রথম নর-নারীর জীবন

যাপনে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ'—এটাই এই প্রবাদ দুটির গঠিত হবার মূল সূত্র। এখন চলতি কথায় বলা হয় "নিষিদ্ধ ফল" যখন খেয়েইছো, তখন তার ঝামেলাটাও পোহাতে হবে বৈকি!'

'জ্ঞানবৃক্ষের ফল'— যে ফল খেয়ে পৃথিবীর আদিম মানব মানবীর জ্ঞান চোখ খুলেছিল। প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে 'জ্ঞান-চোখ খোলা'—এটিও একটি প্রচলিত বাগধারা বিশেষ। 'জ্ঞান বৃক্ষের ফল' শব্দগুচ্ছের অর্থ খুব সরল : যেমন 'বাবু এখন জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছেন মা-বাপের কথা এখন ভালো লাগবে কেন?'

* **'নোয়ার নৌকা'**—পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি হবার পর পুনরায় পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়ে গেল। ঈশ্বর তখন পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য জলপ্লাবন ঘটালেন। নোয়া নামক এক পুণ্যবান ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখলেন। ঈশ্বর তাঁকে নির্দেশ দেন, তাঁর পরিবার এবং পৃথিবীর স্থলচর, জলচর ও নভোচরদের এক জোড়া করে প্রাণীকে একটি বিশাল নৌকায় তুলে বন্যার হাত থেকে উদ্ধার করে। তার পর চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ধরে চলে জলপ্লাবন। এই বিচিত্র পুরাকাহিনীর একটি বিশেষ শব্দ হল 'নোয়ার নৌকা'। পরবর্তী কালে এই শব্দটি প্রতীকী শব্দ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রাচ্যের পণ্ডিতবর্গ—যিশু খ্রিস্টের জন্ম কাহিনির সঙ্গে জড়িত তিন জ্যোতিষী পণ্ডিত। ইংরাজি অভিধানে এঁদের বলা হয়েছে 'Magi'। যার মধ্যে থাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান তখন তাকে ওই অভিধা দেওয়া হয়। বাইবেলে কাহিনীর পণ্ডিতদের জন্যই এই নাম। মুখের কথায় বিশেষত ব্যঙ্গাত্মক সংলাপে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে 'Three Wise Men of the East' প্রবাদাঙ্গটি এতই সরল যে তা বাঙালি সমাজে প্রায় এই ভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যেমন বুনবে তেমন কাটবে—যে সমস্ত প্রবাদাঙ্গ প্রত্যক্ষ নয় কিন্তু পরোক্ষভাবে 'নিউ টেস্টামেন্ট' থেকে সৃষ্টি হয়েছে, এটি তার মধ্যে একটি। যিশুর পর্বতে দেওয়া উপদেশের একটি Parable বা দৃষ্টান্ত বাক্য। শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্ত কথায়—কোনো এক ব্যক্তির কৃষিক্ষেত্রে গমের সঙ্গে শ্যামাঘাসের চারা বেরোল। শস্য বড় হলে ছেদকরা শ্যামাঘাস বাদ দিয়ে গমগুলিকেই কেবল সংগ্রহ করল। প্রকৃতপক্ষে গমের ক্ষেত্রে শ্যামাঘাস ছড়িয়ে দিয়েছিল শত্রুপক্ষ। তাই শস্য সংগ্রহের সময়ে ছেদকেরা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছিল; যেন প্রকৃত আগাছা বাদ পড়ে। 'সেন্ট ম্যাথিউ' এর ১৩ অধ্যায়ে বিশদ বর্ণনা আছে। ইংরাজিতে একটি মহাজন বাক্য আছে 'As You Sow, So You reap'—যেমন বুনবে তেমন কাটবে। যদি এটি এই ইংরাজির বাংলা অনুবাদও হয় তবেও তা সার্থক। বাংলা প্রবাদাঙ্গ হিসাবে জনপ্রিয়।

'মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না'—যিশু যখন দীর্ঘদিন প্রান্তরে প্রার্থনায় ছিলেন তখন শয়তান তাঁকে ভয় দেখিয়ে ছিল। ক্ষুধার্ত যিশুকে শয়তান বলেছিল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র; তবে পাথরকে বল, রুটিতে পরিণত হয়।' যিশু তখন উত্তরে বলেছিল, 'মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না'। এই প্রবাদটির একটি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন দেখা যায়। "মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না। তার সঙ্গে চাই আমূল মাখন।' বিজ্ঞাপনের ভাষাটি খুবই মননশীল ও জনপ্রিয়। মূল ভাবের সঙ্গে একটা বৈপরীত্য আছে বলেই বক্তব্যটি রসালো হয়ে উঠেছে। মনেও ছাপ ফেলে।

'শেষের সেদিন'—একটি পরিচিত ব্রহ্ম সংগীত আছে 'মনে করো শেষের সেদিন কী ভয়ংকর'। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বাইবেল নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। উভয় ধর্মসমাজের পারস্পরিক আদানপ্রদানে এই শব্দগুচ্ছটি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বাইবেলে যিশুর উপদেশে এই তত্ত্বটি প্রায় ধ্বনিত হয়েছে—তবে রূপকার্থে। বাইবেলে আছে—'শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হল; তেমনি যুগান্তে সেরকম হবে।'

'কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা'—খ্রিস্টান সমাজে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। বাইবেলের প্রথম গ্রন্থ আদি পুস্তকে কফিন প্রসঙ্গ আছে। মিশরে মৃত্যু হয়েছিল যোসেফের। তাঁর মৃত্যুতে কফিন ব্যবহার করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কফিন ব্যবহার প্রচলিত হবার পর মৃতদেহ কবর দেবার সময় সমবেত জনগণের সামনে মৃতদেহকে শেষবারের মতো দর্শন করিয়ে কফিনের উপরের ডালায় পেরেক পুতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়। এর পর আর কারোর পক্ষেই সেই মৃত ব্যক্তির মুখ দেখা সম্ভব হয় না। এই প্রবাদটি বহুল প্রচারিত।

প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা প্রয়োজন আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ক্রমশ এই বাইবেলের প্রবাদগুলি বাংলার সাহিত্য ও সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করবে। নদীর মতো ভাষার ধর্ম হচ্ছে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। আমাদের বেদ-পুরাণ, মহাকাব্যের মিথের সঙ্গে বিদেশের মহাগ্রন্থ বাইবেলের মিথ-প্রবাদগুলি ধীরে ধীরে সমাজের স্রোতে মিশে যাবে। কেননা সকল দেশের, ধর্মের, জাতির প্রবাদ পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ব্যবহার করতে পারলেই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি। তবে মাত্র দুশো বছর সময়ে একটি বিদেশি ধর্ম গ্রন্থ বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে সমাজ ও সাহিত্যে মিলেমিশে একীভূত হয়ে গেছে। এশিয়ার যিসাস, বাংলার যিশুকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে বাঙালি করে নিয়েছে। বড়দিনে কেক আর কমলালেবু বাঙালির বারোমাসের চোদ্দপার্বণ হয়ে গেছে। বাংলায় বাইবেল তাই দুশো বছর পরে এই পর্যালোচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাংলায় বাইবেল বাঙালির কাছে এক ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১। পবিত্র বাইবেল—ভারতের বাইবেল সোসাইটি—ব্যাঙ্গালোর—১৯৮০।
২। মঙ্গলবার্তা—জেভিয়ার প্রকাশনী—কলকাতা—চতুর্থ প্রকাশ—১৯৯৩।
৩। বিজয় বাইবেল—ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল সোসাইটি—ইউ. এস. এ—১৯৯২।
৪। ছোটদের বাইবেল—ভারতের বাইবেল সোসাইটি ব্যাঙ্গালোর—১৯৯০।
৫। মঙ্গলবার্তা বাইবেল কোন্ দিক থেকে অভিনব—খ্রিস্তিয়াঁ মিংঙো-মোহনা সাময়িকী-কলকাতা-২০০৩।
৬। বাংলা ভাষায় বাইবেল চর্চা—গবেষণাপত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—সুরঞ্জন মিদ্দে—২০০১।

Suranjan MIddye, Department of Bengali, Rabindrabharati University, Kolkata

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও রবীন্দ্রনাথ

অনল বিশ্বাস

১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হল। যুদ্ধে মিত্র শক্তির জয় হয়েছে। বিজয়ী দেশগুলি সন্ধিচুক্তির জন্যে ভার্সাই সম্মেলনে বসেছে। রাষ্ট্রসংঘের অভিভাবকত্বে একপেশে আলোচনায় 'লুঠের বখরা' ভাগাভাগিতে পৃথিবীর মানচিত্রের হল বিপুল পরিবর্তন। জার্মানি ইত্যাদি পরাজিত দেশগুলি হল ছিন্নভিন্ন, তাদের সমস্ত উপনিবেশ নেওয়া হল কেড়ে। এই মারণযজ্ঞে দেড়কোটি মানুষের মৃত্যু হল পঙ্গু হল তার দ্বিগুণ। যুদ্ধের অনিবার্য ফল—দুর্ভিক্ষ-মহামারী, স্বজনহারা-গৃহহীন, বেকার, চারদিকে শুধু হাহাকার। যাঁরা ভেবেছিলেন যুদ্ধ শেষ হলে পৃথিবীতে শান্তি আসবে তাদের মোহভঙ্গ হল।

যুদ্ধ বিজেতারা যেমন হিংস্র আক্রোশে প্রতিশোধে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল আর পরাজিতেরা বিপর্যস্ত বিদীর্ণ এবং বিক্ষিত হৃদয়ে সেই গুরুভার মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ফলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা যুদ্ধের অনিবার্য বীজ প্রোথিত হয়েছিল।

ইতালি, জার্মানি, জাপান নিজেদের জমি শক্ত করতে শুরু করল, খুব তাড়াতাড়িই তারা নিজেদের উন্নত সমর সজ্জায় প্রস্তুত করে ফেলল। অতীতের রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রতীক একটা কুড়ালের চারধারে একগোছা কাঠের টুকরো বাঁধা। এটাকে বলা হয় Fasces. এর থেকেই ফ্যাসিস্ত কথাটার উৎপত্তি। এই প্রতীক নিয়ে মুসলিনী ১৯২২ সালে তার রাজনৈতিক দল গঠন করে দেশের ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের নামে ভাঁওতা দিয়ে যৌথ রাষ্ট্রের ধারণা চালু করল। জার্মানিতে হিটলারের পার্টির নাম ছিল—জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি। জার্মান ভাষায় এই নামের শব্দগুলির আদ্যাক্ষর নিয়ে দাঁড়ায় NAZI, বাংলা উচ্চারণে বলা হয় নাৎসি। এই বাহিনীর পতাকার রঙ ছিল লাল। যার উপরে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা, মুসলিনীর শিষ্য হিসাবেই হিটলার বিশেষভাবে পরিচিত হলেও তিনি স্বক্ষেত্রে গুরুকেও লজ্জায় ফেলে দেবার মতো কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইত্যালি এবং তার পিছু পিছু জার্মানিতে এই ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসিবাদ সারা ইউরোপে তথা পৃথিবীতে জান্তব সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী তাৎপর্য সামনে নিয়ে আসে। এর সবচেয়ে বড় ঘটনা রাশিয়ায় 'নভেম্বর বিপ্লব' বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লব পৃথিবীকে শুনিয়েছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী। আর কার্ল মার্কসের জীবন দর্শন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত

বিশ্বাস, অনল : ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও রবীন্দ্রনাথ
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 67-77